# শ্রাবণ-গাথা





শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(2341)

# শ্রাবণ-গাথা

# শ্রাবণ-গাথা

প্রথম অভিনয়
২৬শে ও ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৪১
শান্তিনিকেতন।

মূল্য—আট আনা

# শ্রাবণ-গাথা

নটরাজ

মহারাজ, আদেশ করেন যদি, বর্ষার অভ্যর্থনা দিয়ে আজ উৎসবের ভূমিকা করা যাক।—

রাজা

ভূমিকার কী প্রয়োজন?

নটরাজ

ধুয়োর যে প্রয়োজন গানে। ঐ ধুয়োটাই অঙ্কুরের মতো ছোটো হয়ে দেখা দেয়, তার পরে শাখায় পল্লবে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

রাজা

আচ্ছা তাহোলে বিলম্বে কাজ নেই।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা,
শ্যাম গম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলাকলাপী কেকা-কলরবে বিহরে;
নিখিল চিত্ত-হরষা
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা॥
কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক ললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতী-মালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।

ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা,
কোথা বিরহিণী কোথা তোরা অভিসারিকা ॥
আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা,
এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জকুটীরে অয়ি ভাবাকুললোচনা
ভূর্জ্জপাতায় করো নবগীত রচনা,
মেঘমল্লার রাগিণী;
এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিণী ॥
কেতকী কেশরে কেশপাশ করো সুরভী,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি' লয়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিত-বিকশিত বয়নে,
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে ॥
এসেছে বরষা, এসেছে নবীন বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবনভরসা,
দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি' আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে গন্ধ-মদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা,
শতশত গীত-মুখরিত বনবীথিকা ॥

নটরাজ

ওগো কমলিকা, এখন তবে সুরু করো তোমাদের পালা।

রাজা

কী দিয়ে সুরু করবে?

নটরাজ

বনভূমির আত্মনিবেদন দিয়ে।

রাজা

কার কাছে আত্মনিবেদন?

নটরাজ

আকাশপথে যিনি এসেছেন অতিথি—আবির্ভাব যাঁর অরণ্যের রাসমঞ্চে, পূর্ব্বদিগন্তে উড়েছে যাঁর কেশকলাপ।

সভাকবি

ওহে নটরাজ, আমরা আধুনিককালের কবি—ফুলকাটা বুলি দিয়ে আমরা কথা কইনে—তুমি যেটা অত করে ঘুরিয়ে বল্‌লে, আমরা সেটাকে সাদাভাষায় ব'লে থাকি বাদ্‌লা।

নটরাজ

বাদ্‌লা নামে রাজপথের ধূলোয়, সেটাকে দেয় কাদা ক'রে, বাদলা নামে রাজ-প্রহরীদের পাগড়ির 'পরে, তার পাকে পাকে জমিয়ে তোলে কফের প্রকোপ। আমি যাঁর কথা বলছি তিনি নামেন ধরণীর প্রাণমন্দিরে, বিরহীর মর্ম্মবেদনায়।

রাজা

তোমাদের দেশের লোক কথা জমাতে পারে বটে।

সভাকবি

ওঁদের শব্দ আছে বিস্তর কিন্তু মহারাজ, অর্থের বড়ো টানাটানি।

নটরাজ

নইলে রাজদ্বারে আস্‌ব কোন্ দুঃখে। এইবার সুরু করো।

বাকি আমি রাখব না কিছুই।
তোমার চলার পথে পথে ছেয়ে দেব ভুঁই।
ওগো, মোহন, তোমার উত্তরীয় গন্ধে আমার ভরে নিয়ো,
উজাড় করে দেব পায়ে বকুল বেলা জুঁই॥

পুরব সাগর পার হয়ে যে এলে পথিক তুমি,
আমার সকল দেব অতিথিরে আমি বনভূমি।
আমার কুলায় ভরা রয়েছে গান,
সব তোমারেই করেছি দান,
দেবার কাঙাল করে আমায়
চরণ যখন ছুঁই ॥

রাজা

দেখলুম শুনলুম, লাগ্‌ল ভালো, কিন্তু বুঝে প'ড়ে নিতে গেলে পুঁথির দরকার। আছে পুঁথি?

নটরাজ

এই নাও মহারাজ।

রাজা

তোমাদের অক্ষরের ছাঁদটা সুন্দর কিন্তু বোঝা শক্ত। এ কি চীনা অক্ষরে লেখা না কি?

নটরাজ

বল্‌তে পারেন অচিনা অক্ষরে।

রাজা

কিন্তু রচনা যার সে গেল কোথায়?

নটরাজ

সে পালিয়েছে।

রাজা

পরিহাস ব'লে ঠেকছে। পালাবার তাৎপর্য্য কী?

নটরাজ

পাছে এখানকার বুদ্ধিমানরা বলেন, কিছুই বোঝা যাচ্চে না। আরো দুঃখের বিষয়—যদি কিছু না ব'লে হাঁ ক'রে থাকেন।

সভাকবি

এ তো বড়ো কৌতুক! পাঁজিতে লিখ্‌ছে পূর্ণিমা, এদিকে চাঁদ মেরেছেন দৌড়, পাছে কেউ ব'লে বসে তাঁর আলোটা ঝাপ্‌সা।

নটরাজ

বিশল্যকরণীটারই দরকার, গন্ধমাদনটা বাদ দিলেও চলে। না-ই রইলেন কবি, গানগুলো রইল।

সভাকবি

একটা ভাবনার বিষয় রয়ে গেল। গানে স্বয়ং কবিই সুর বসিয়েছেন না কি?

নটরাজ

তা নয় তো কী? ফুলে যিনি দিয়েছেন রং তিনিই লাগিয়েছেন গন্ধ।

সভাকবি

সর্ব্বনাশ! নিজের অধিকারে পেয়ে এবার দেবেন রাগিণীর মাথা হেঁট ক'রে। বাণীকে উপরে চড়িয়ে দিয়ে বীণার ঘটাবেন অপমান।

নটরাজ

অপমান ঘটানো এ'কে বলে না এ পরিণয় ঘটানো। রাগিণী যতদিন অনূঢ়া ততদিন তিনি স্বতন্ত্র। কাব্যের সঙ্গে বিবাহ হোলেই তিনি কবিত্বের ছায়েবানুগতা। সপ্তপদী গমনের সময় কাব্যই যদি রাগিণীর পিছন পিছন চলে, সেটাকে বলব স্ত্রৈণের লক্ষণ। সেটা তোমাদের গৌড়ীয় পারিবারিক রীতি হোতে পারে কিন্তু রসরাজ্যের রীতি নয়।

রাজা

ওহে কবি, কথাটা বোধ হচ্চে যেন তোমাকেই লক্ষ্য ক'রে। ঘরের খবর জান্‌লে কী ক'রে?

সভাকবি

জনশ্রুতির 'পরে ভার, বানানো কথায় লোকরঞ্জন করা।

রাজা

জনশ্রুতিকে তাহোলে কবি আখ্যা দিলে হয়। অলমতিবিস্তরেণ। যথারীতি কাজ আরম্ভ করো।

সভাকবি

আমরা সহ্য করব ওঁদের স্বরবর্ষণ মহাবীর ভীষ্মের মতো।

### নটরাজ

ধরণীর তপস্যা সার্থক হয়েছে, প্রণতি। রুদ্র আজ বন্ধুরূপ ধরেছেন, তাঁর তৃতীয় নেত্রের জ্বলদগ্নিদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে শ্যামল জটাভার—প্রসন্ন তাঁর মুখ। প্রথমে সেই বন্ধুদর্শনের আনন্দকে আজ মুখরিত করো।

তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে,
হৃদয় আমার, শ্যামল বঁধুর করুণ স্পর্শ নে।
অঝোর-ঝরন শ্রাবণ জলে
তিমির-মেদুর বনাঞ্চলে
ফুটুক্ সোনার কদম্বফুল নিবিড় হর্ষণে।
ভরুক গগন. ভরুক কানন, ভরুক নিখিল ধরা,
দেখুক ভুবন মিলন-স্বপন মধুর বেদনা ভরা।
পরাণ-ভরানো ঘন ছায়াজাল
বাহিব আকাশ করুক আড়াল,
নয়ন ভুলুক্, বিজুলি ঝলুক পরম দর্শনে॥

নমো নমো নম করুণাঘন নমহে।
নয়নস্নিগ্ধ অমৃতাঞ্জন পরশে,
জীবন পূর্ণ সুধারস বরষে,
তব দর্শনধন-সার্থক মন হে,
অকৃপণবর্ষণ করুণাঘন হে।
নম হে নম হে॥

### সভাকবি

নটরাজ, মহারাণী মাতার কল্যাণে সেদিন রাজবাড়ি থেকে কিছু ভোজ্য-পানীয় সংগ্রহ করে নিয়ে আসছিলেম গৃহিণীর ভাণ্ডার-অভিমুখে। মধ্যপথে বাহনটা পড়ল উঁচট খেয়ে, ছড়িয়ে পড়ল মোদক মিষ্টান্ন পথের পাঁকে, গড়িয়ে পড়ল পায়সান্ন ভাঙা হাঁড়ি থেকে নালার মধ্যে। তখন মুষলধারে বর্ষণ হচ্চে—নৈবেদ্যটা শ্রাবণ স্বয়ং নিয়ে গেলেন ভাসিয়ে। তোমাদের এই প্রণামটাও দেখি সেই রকম। খুবই ছড়িয়েছ বটে কিন্তু পৌঁছল কোথায় ভেবে পাচ্চিনে।

নটরাজ

কবিবর, আমাদের প্রণামের রস তোমার হাঁড়িভাঙা পায়েসের রস নয়—ওকে নষ্ট করতে পারবে না কোনো পাঁকের অপদেবতা—সুরের পাত্রে রইল ও চিরকালের মতো—চিরকালের শ্যামল বঁধুর ভোগে বর্ষে বর্ষে ওর অক্ষয় উৎসর্গ।

রাজা

কিছু মনে কোরো না নটরাজ, আমাদের সভাকবি দুঃসহ আধুনিক। হাঁড়ি-ভাঙা পায়েসের রস পাঁকে গড়ালে উনি সেটাকে নিয়ে চৌর-পঞ্চশতক রচনা করতে পারেন কিন্তু তৃপ্তি পান না সেই রসে যার সঙ্গে না আছে জঠরের যোগ না আছে ভাণ্ডারের। তোমার কাজ অসঙ্কোচে করে যাও, এখানে অন্য শ্রোতাও আছে।

নটরাজ

বনমালিনী, এবার তবে বর্ষাধারাস্নানের আমন্ত্রণ ঘোষণা করে দাও নূপুরের ঝঙ্কারে, নৃত্যের হিল্লোলে। চেয়ে দেখো শ্রাবণঘনশ্যামলার সিক্ত বেণীবন্ধন দিগন্তে স্খলিত, তার ছায়াবসনাঞ্চল প্রসারিত ঐ তমালতালী-বনশ্রেণীর শিখরে শিখরে।

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে,
এসো করো স্নান নবধারা জলে।
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
পরো দেহ ঘেরি' মেঘ-নীল বেশ,
কাজল নয়নে যূথীমালা গলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে।
আজি ক্ষণে ক্ষণে হাসিখানি সখী
অধরে নয়নে উঠুক চমকি'।
মল্লার গানে তব মধুস্বরে
দিক্ বাণী আনি' বনমর্ম্মরে,—
ঘন বরিষণে জল-কলকলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে॥

রাজা

উত্তম। কিন্তু চাঞ্চল্য যেন কিছু বেশি, বর্ষাঋতু তো বসন্ত নয়।

নটরাজ

তাহোলে ভিতরে তাকিয়ে দেখুন। সেখানে পুলক জেগেছে, সে পুলক গভীর, সে প্রশান্ত।

সভাকবি

ঐ তো মুস্কিল। ভিতরের দিকে ? ওদিকটাতে বাঁধা রাস্তা নেই তো।

নটরাজ

পথ পাওয়া যাবে সুরের স্রোতে। অন্তরাকাশে সজল হাওয়া মুখর হয়ে উঠ্‌ল। বিরহের দীর্ঘনিশ্বাস উঠেছে সেখানে—কার বিরহ জানা নেই। ওগো গীতরসিকা, বিশ্ববেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল করো।

ঝরে ঝর ঝর ভাদর বাদর
বিরহকাতর শর্ব্বরী।
ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন
কানন কানন মর্ম্মরি'।
আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ
গগনে গগনে উঠিল বাজিয়ে।
হৃদয় এ কী রে ব্যাপিল তিমিরে
সমীরে সমীরে সঞ্চরি'॥

রাজা

কী বলো হে, কী মনে হচ্চে তোমার ?

সভাকবি

সত্য কথা বলি মহারাজ। অনেক কবিত্ব করেছি, অমরুশতক পেরিয়ে শান্তিশতকে পৌঁছবার বয়স হয়ে এল—কিন্তু এই যে এঁরা অশরীরী বিরহের কথা বলেন যা নিরবলম্ব, এটা কেমন যেন প্রেতলোকের ব্যাপার ব'লে মনে হয়।

রাজা

শুন্‌লে তো নটরাজ! একটু মিলনের আভাস লাগাও, অন্তত দূর থেকে আশা পাওয়া যায় এমন আয়োজন করতে দোষ কী ?

সভাকবি

ঠিক বলেছেন মহারাজ। পাত পেড়ে বস্‌লে ওঁদের মতে যদি কবিত্ববিরুদ্ধ হয় অন্তত রান্নাঘর থেকে গন্ধটা বাতাসে মেলে দিতে দোষ কী ?

নটরাজ

বরমপি বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যা। পেটভরা মিলনে সুর চাপা পড়ে, একটু ক্ষুধা বাকি রাখা চাই কবিরাজরা এমন কথা ব'লে থাকেন। আচ্ছা তবে মিলন-তরীর সারিগান বিরহবন্যার ওপার থেকে আসুক সজল হাওয়ায়।

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে।
উৎসব সভামাঝে শ্রাবণের বীণা বাজে,
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে॥
দুই কূল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরঙ্গে।
কাঁপিছে বনের হিয়া বরষণে মুখরিয়া
বিজলি ঝলিয়া উঠে নব ঘন মন্দ্রে॥

রাজা

এ গানটাতে একটু উৎসাহ আছে। দেখছি তোমার মৃদঙ্গওয়ালার হাত দুটো অস্থির হয়ে উঠেছে—ওকে একটু কাজ দাও।

নটরাজ

এবার তাহোলে একটা অশ্রুত গীতচ্ছন্দের মূর্ত্তি দেখা যাক।

সভাকবি

শুন্‌লেন ভাষাটা! অশ্রুত গীত! নিরন্ন ভোজের আয়োজন।

রাজা

দোষ দিয়ো না, যাদের যেমন রীতি। তোমাদের নিমন্ত্রণে আমিষের প্রাচুর্য্য।

সভাকবি

আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, আমরা আধুনিক, আমিষলোলুপ।

নটরাজ

শ্যামলিয়া, দেহভঙ্গীর নিঃশব্দ গানের জন্যে অপেক্ষা করছি।

নাচ

রাজা

অতি উত্তম। শূন্যকে পূর্ণ করেছ তুমি। এই নাও পুরস্কার। নটরাজ—তোমাদের পালা গানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করে দেখেছি এতে বিরহের অংশটাই যেন বেশি। তাতে ওজন ঠিক থাকে না।

নটরাজ

মহারাজ, রসের ওজন আয়তনে নয়। সমস্ত গাছ একদিকে, একটিমাত্র ফুল একদিকে, তাতেও ওজন থাকে। অসীম অন্ধকার একদিকে, একটি তারা একদিকে, তাতেও ওজনের ভুল হয় না। বিরহের সরোবর হোক্ না অকূল, তারি মধ্যে একটিমাত্র মিলনের পদ্মই যথেষ্ট।

সভাকবি

এঁদের দেশের লোক বাচালের সেরা, কথায় পেরে উঠ্‌বেন না। আমি বলি সন্ধি করা যাক—ক্ষণকালের জন্যে মিলনও ক্ষান্ত দিক্, বিরহও চুপ মেরে থাক্। শ্রাবণ তো মেয়ে নয় মহারাজ, সে পুরুষ, ওঁর গানে সেই পুরুষের মূর্ত্তি দেখিয়ে দিন্ না।

নটরাজ

ভালো বলেছ কবি। তবে এসো উগ্রসেন, উন্মত্তকে বাঁধো কঠিন ছন্দে, বজ্রকে মঞ্জীর ক'রে নাচুক ভৈরবের অনুচর।

হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু
ঘন মেঘের ভুরু কুটিল কুঞ্চিত।
হোলো রোমাঞ্চিত বন-বনান্তর,
দুলিল চঞ্চল বক্ষ-হিন্দোলে
মিলনস্বপ্নে সে কোন অতিথি রে!
সঘন-বর্ষণ-শব্দ-মুখরিত
বজ্রসচকিত ত্রস্ত শর্ব্বরী,
মালতী বল্লরী কাঁপায় পল্লব
করুণ কল্লোলে, কানন শঙ্কিত
ঝিল্লীঝঙ্কৃত।

রাজা

এই তো নৃত্য! কঠিনের বক্ষপ্লাবী আনন্দের নির্ঝর। এ তো মন ভোলাবার নয়, এ মন দোলাবার।

সভাকবি

কিন্তু এই দুর্দ্দম আবেগ বেশিক্ষণ সইবে না। ঐ দেখুন আপনার পারিষদের দল নেপথ্যের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্চে। কড়াভোগ ওদের গলা দিয়ে নামে না, একটু মিঠুয়া চাই।

রাজা

নটরাজ, শুনলে তো। অতএব কিঞ্চিৎ মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ।

নটরাজ

প্রস্তুত আছি। তাহোলে শ্রাবণপূর্ণিমার লুকোচুরির কথাটা ফাঁস করে দেওয়া যাক্।—

ওগো শ্রাবণের পূর্ণিমা আমার
আজি রইলে আড়ালে।
স্বপনের আবরণে লুকিয়ে দাঁড়ালে॥
আপনারি মনে জানিনে একেলা
হৃদয় আঙিনায় করিছ কী খেলা,
তুমি আপনায় খুঁজে কি ফেরো
কি তুমি আপনায় হারালে?
এ কি মনে রাখা, এ কি ভুলে যাওয়া,
এ কি স্রোতে ভাসা, এ কি কূলে বাওয়া?
কভু বা নয়ানে কভু বা পরাণে
করো লুকোচুরি কেন-যে কে জানে,
কভু বা ছায়ায় কভু বা আলোয়
কোন্ দোলায়-যে নাড়ালে॥

রাজা

বুঝতে পারলুম না এঁর মনোরঞ্জন হোলো কিনা। সে অসাধ্য চেষ্টায় প্রয়োজন নেই। আমার অনুরোধ এই, রসের ধারাবর্ষণ যথেষ্ট হয়েছে, এখন রসের ঝোড়ো হাওয়া লাগিয়ে দাও।

নটরাজ

মহারাজ আপনার সঙ্গে আমারও মনের ভাব মিলছে। এবার শ্রাবণের ভেরীধ্বনি শোনা যাক। সুপ্তকে জাগিয়ে তুলুক, চেতিয়ে তুলুক অন্যমনাকে।

ওরে ঝড় নেমে আয় আয়রে আমার শুকনো পাতার ডালে,—
এই বরষায় নব শ্যামের আগমনের কালে।
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন, যা আনন্দহারা
চরম রাতের অশ্রুধারায় আজ হয়ে যাক সারা,
যাবার যাহা যাক্ সে চ'লে রুদ্রনাচের তালে॥
আসন আমার পাততে হবে রিক্ত প্রাণের ঘরে
নবীন বসন পরতে হবে সিক্ত বুকের 'পরে।
নদীর জলে বান ডেকেছে, কূল গেল তার ভেসে,
যূথীবনের গন্ধবাণী ছুট্‌ল নিরুদ্দেশে,—
পরাণ আমার জাগ্‌ল বুঝি মরণ-অন্তরালে॥

রাজা

আমার সভাকবিকে বিমর্ষ করে দিয়েছ। তোমাদের এই গানে গানকে ছাড়িয়ে গানের কবিকে দেখা যাচ্চে বেশি, ঐখানে উনি দেখছেন ওঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে। মনে মনে তর্ক করছেন কী ক'রে আধুনিক ভাষায় এর খুব একটা কর্কশ জবাব দেওয়া যায়। আমি বলি—কাজ নেই, একটা সাদা ভাবের গান সাদা সুরে ধরো, যদি সম্ভব হয়, ওঁর মনটা সুস্থ হোক্।

নটরাজ

মহারাজের আদেশ পালন করব। আমাদের ভাষায় যতটা সম্ভব সহজ করেই প্রকাশ করব, কিন্তু যত্নেকৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্রদোষঃ। সকরুণা, এই বারিপতনশব্দের সঙ্গে মিলিয়ে বিচ্ছেদের আশঙ্কাকে সুরের যোগে মধুর করে তোলো।

ভেবেছিলেম আসবে ফিরে,
তাই ফাগুন-শেষে দিলেম বিদায়।
যখন গেলে তখন ভাসি নয়ননীরে
এখন শ্রাবণদিনে মরি দ্বিধায়।
বাদল সাঁঝের অন্ধকারে
আপনি কাঁদাই আপনারে,
একা ঝর ঝর বারিধারে
ভাবি কী ডাকে ফিরাব তোমায়॥

যখন থাকো আঁখির কাছে
তখন দেখি ভিতর বাহির
সব ভ'রে আছে।
সেই ভরা দিনের ভরসাতে
চাই বিরহের ভয় ঘোচাতে,
তবু তোমাহারা বিজনরাতে
কেবল হারাই হারাই বাজে হিয়ায়॥

সভাকবি

নটরাজ, আমার ধারণা ছিল বসন্ত ঋতুরই ধাতটা বায়ুপ্রধান—সেই বায়ুর প্রকোপেই বিরহ মিলনের প্রলাপটা প্রবল হয়ে ওঠে। কফপ্রধান ধাত বর্ষার—কিন্তু তোমার পালায় তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছ। রক্ত হয়েছে তার চঞ্চল। তাহোলে বর্ষায় বসন্তে প্রভেদটা কী?

নটরাজ

সোজা কথায় বুঝিয়ে দেব—বসন্তের পাখী গান করে, বর্ষার পাখী উড়ে চলে।

সভাকবি

তোমাদের দেশে এইটেকেই সোজা কথা বলে! আমাদের প্রতি কিছু দয়া থাকে যদি কথাটা আরো সোজা করতে হবে।

নটরাজ

বসন্তে কোকিল ডালপালার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে বনচ্ছায়াকে সকরুণ করে তোলে—আর বর্ষায় বলাকাই বলো হংসশ্রেণীই বলো উধাও হয়ে মুক্তপথে চলে শূন্যে—কৈলাসশিখর থেকে বেরিয়ে পড়ে অকূল সমুদ্রতটের দিকে। ভাবনার এই দুই জাত আছে। মুখের তর্ক ছেড়ে সুরের ব্যাখ্যা ধরা যাক্। পূরবিকা, ধরো গান।—

মেঘের কোলে কোলে যায়রে চলে বকের পাঁতি।
ওরা ঘরছাড়া মোর মনের কথা যায় বুঝি ঐ গাঁথি' গাঁথি'।
সুদূরের বাঁশির স্বরে কে ওদের হৃদয় হরে,
দুরাশার দুঃসাহসে উদাস করে;
উধাও হাওয়ার পাগলামিতে পাখা ওদের ওঠে মাতি'॥

ওদের ঘুম ছুটেছে ভয় টুটেছে একেবারে ;
অলক্ষেতে লক্ষ্য ওদের পিছন পানে তাকায় নারে।
যে-বাসা ছিল জানা, সে ওদের দিল হানা,
না-জানার পথে ওদের নাইরে মানা ;
ওরা দিনের শেষে দেখেছে কোন্ মনোহরণ আঁধার রাতি ॥

নটরাজ

আপনার ঐ সভাকবির মুখখানা কিছুক্ষণ বন্ধ রাখুন। ওঁর গোমুখী-বিনিঃসৃত বাক্যনির্ঝর এদেশের কঠোর শিলা-খণ্ডের উপর পাক খেয়ে বেড়াক। আমরা এনেছি সুরলোকের ধারা—আলোকের সভাপ্রাঙ্গণ ধুয়ে দিতে হবে। কাজ শেষ হোলেই বিদায় নেব।

রাজা

আচ্ছা নটরাজ, তোমার পথের উপদ্রবকে নিরস্ত রাখব। পাল তুলে চলে যাও।

নটরাজ

মঞ্জুলা, তাহোলে হাওয়াটা শোধন করে নিয়ে আর একবার আবাহন গান ধরো।

তৃষ্ণার শান্তি,
সুন্দর কান্তি,
তুমি এলে নিখিলের সন্তাপভঞ্জন ॥
আঁকো ধরা বক্ষে
দিগ্‌বধূ-চক্ষে
সুশীতল সুকোমল শ্যামরসরঞ্জন।
এলে বীর ছন্দে,
তব কটিবন্ধে
বিদ্যুৎ-অসিলতা বেজে ওঠে ঝঞ্জন ॥
তব উত্তরীয়ে
ছায়া দিলে ভরিয়ে
তমাল-বনশিখরে নবনীল অঞ্জন।

ঝিল্লির মন্দ্রে
মালতীর গন্ধে
মিলাইলে চঞ্চল মধুকর-গুঞ্জন।
নৃত্যের ভঙ্গে,
এলে নবরঙ্গে,
সচকিত পল্লবে নাচে যেন খঞ্জন॥

রাজা

ওহে নটরাজ, সভাকবির মুখে আর শব্দমাত্র নেই। এর চেয়ে বড়ো সাধুবাদ আর আশা কোরো না।

সভাকবি

আছে মহারাজ আছে, বলবার বিষয় আছে—হঠাৎ মুখবন্ধ করে দেবেন না।

রাজা

আচ্ছা বলো।—

সভাকবি

আমি আধুনিক বটে কিন্তু নাচ সম্বন্ধে আমি প্রাচীনপন্থী।

রাজা

কী বলতে চাও?

সভাকবি

নৃত্যকলায় দোষ আছে, ওটাকে হেয় করে রাখাই শ্রেয়।

রাজা

কাব্যে কোথাও কোনো দোষ সম্ভব নয় বুঝি! কত কালিদাস এবং অকালিদাস দেখা গেল, ওঁদের শ্লোকগুলোর মধ্যে পাঁক বাঁচিয়ে চলা দায় যে।

সভাকবি

কাব্য বলুন, গীতকলা বলুন, ওরা অভিজাতশ্রেণীয়, ওদের দোষকেও শিরোধার্য্য করতে হয়—কিন্তু ঐ নৃত্যকলার আভিজাত্য নেই—গৌড়দেশের ব্রাহ্মণরা ওকে অনাচরণীয়া ব'লে থাকেন।

নটরাজ

কবিবর, তোমার গৌড়দেশের সূচনা হবার বহু পূর্ব্বে যখন আদিদেবের আহ্বানে সৃষ্টি-উৎসব জাগল তখন তার প্রথম আরম্ভ হোলো আকাশে আকাশে বহ্নিমালার নৃত্যে। সূর্য্যচন্দ্রের নৃত্য আজও বিরাম পেল না, ষড়্ঋতুর নৃত্য আজও চলেছে পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রে। সুরলোকে আলোক-অন্ধকারের যুগল নৃত্য, নরলোকে অশ্রান্ত নৃত্য জন্মমৃত্যুর। সৃষ্টির আদিম ভাষাই এই নৃত্য, তার অন্তিমেও উন্মত্ত হয়ে উঠবে এই নৃত্যের ভাষাতেই প্রলয়ের অগ্নিনটিনী। মানুষের অঙ্গে অঙ্গে স্বর্গের আনন্দকে তরঙ্গিত করবার ভার নিয়েছি আমরাই, তোমাদের মোহাচ্ছন্ন চোখে নির্ম্মল দৃষ্টি জাগাব, নইলে বৃথা আমাদের সাধনা।

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।
হাসিকান্না হীরা-পান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ,
সে-তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈথৈ॥

রাজা

এর উপরে আর কথা চলে না। এখন আমার একটা অনুরোধ আছে। আমি ভালোবাসি কড়া পাকের রস। বর্ষার সবটাই তো কান্না নয়, ওতে আছে ঐরাবতের গর্জ্জন, আছে উচ্চৈঃশ্রবার দৌড়।

নটরাজ

আছে বই কী। এসো তবে বিদ্যুন্ময়ী, শ্রাবণ যে স্বয়ং বজ্রপাণি মহেন্দ্রের সভাসদ্‌, নৃত্যে সুরে তোমরা তার প্রমাণ করে দাও।

দেখা না দেখায় মেশা হে বিদ্যুৎলতা,
কাঁপাও ঝড়ের বুকে এ কী ব্যাকুলতা।
গগনে সে ঘুরে ঘুরে খোঁজে কাছে, খোঁজে দূরে,
সহসা কী হাসি হাসো, নাহি কহ কথা ॥
আঁধার ঘনায় শূন্যে, নাহি জানে নাম,
কী রুদ্র সন্ধানে সিন্ধু তুলিছে দুর্দ্দাম।
অরণ্য হতাশ প্রাণে আকাশে ললাট হানে,
দিকে দিকে কেঁদে ফিরে কী দুঃসহ ব্যথা ॥

নটরাজ

ওহে ওস্তাদ, তোমার গানের পিছনে পিছনে ঐ যে দলে দলে মেঘ এসে জুটল। গরজত বরখত চমকত বিজুরী—দুই পক্ষের পাল্লা চলুক। সুরে তালে কথায়, আর মেঘে বিদ্যুতে ঝড়ে।

পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণ-গগন-অঙ্গনে।
মনরে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে।
দিক্-হারানো দুঃসাহসে সকল বাঁধন পড়ুক খ'সে,
কিসের বাধা ঘরের কোণে শাসনসীমা-লঙ্ঘনে ॥
বেদনা তোর বিজুল-শিখা জ্বলুক অন্তরে,
সর্ব্বনাশের করিস্ সাধন বজ্র মন্তরে।
অজানাতে করবি গাহন, ঝড় সে হবে পথের বাহন,
শেষ ক'রে দিস্ আপনারে তুই প্রলয় রাতের ক্রন্দনে ॥

সভাকবি

ঐরে ঘুরে ফিরে আবার এসে পড়ল—সেই অজানা, সেই নিরুদ্দেশের পিছনে-ছোটা পাগলামি।

নটরাজ

উজ্জয়িনীর সভাকবিরও ছিল ঐ পাগলামি। মেঘ দেখলেই তাঁকেও পেয়ে বসত অকারণ উৎকণ্ঠা—তিনি বলেছেন "মেঘালোকে ভবতি সুখিনোপ্যন্যথাবৃত্তি-চেতঃ"—এখানকার সভাকবি কি তার প্রতিবাদ করবেন ?

সভাকবি

এত বড়ো সাহস নেই আমার। কালিদাসকে নমস্কার ক'রে যথাসাধ্য চেষ্টা করব মেঘ-দেখা হাহুতাশটাকে মনে আনতে।

নটরাজ

আচ্ছা তবে থাক কিছুক্ষণ হাহুতাশ, এখন অন্য কথা পাড়া যাক্। মহারাজ, সব চেয়ে যারা ছোটো, উৎসবে সব চেয়ে সত্য তাদেরি বাণী। বড়ো বড়ো শাল তাল তমালের কথাই কবিরা বড়ো করে বলেন—যে কচিপাতাগুলি বন জুড়ে কোলাহল করে তাদের জন্যে স্থান রাখেন অল্পই।

রাজা

সত্য বলেছ নটরাজ। ক্রিয়াকর্ম্মের দিনে পাড়ার বুড়ো বুড়ো কর্ত্তারা ভাঙা-গলায় হাঁকডাক করে—কিন্তু উৎসব জমে ওঠে শিশুদের কলরবে।

নটরাজ

ঐ কথাটাই বল্‌তে যাচ্ছিলুম। কিশলয়িনী, এসো তুমি শ্রাবণের আসরে।

ওরা অকারণে চঞ্চল ;
ডালে ডালে দোলে বায়ুহিল্লোলে
নব পল্লবদল।
বাতাসে বাতাসে প্রাণভরা বাণী
শুনিতে পেয়েছে কখন কী জানি,
মর্ম্মর তানে দিকে দিকে আনে কৈশোর কোলাহল।
ওরা কান পেতে শোনে গগনে গগনে মেঘে মেঘে কানাকানি,
বনে বনে জানাজানি।
ওরা প্রাণ-ঝরণার উচ্ছল ধার
ঝরিয়া ঝরিয়া বহে অনিবার,
চিরতাপসিনী ধরণীর ওরা শ্যামশিখা হোমানল ॥

রাজা

সাধু সাধু! কিন্তু নটরাজ, এ হোলো ললিত চাঞ্চল্য—এবার একটা দুর্ললিত চাঞ্চল্য দেখিয়ে দাও।

নটরাজ

এমন চাঞ্চল্য আছে যাতে বাঁধন শক্ত করে, আবার এমন আছে যাতে শিকল ছেঁড়ে। সেই মুক্তির উদ্বেগ আছে শ্রাবণের অন্তরে। এসো তো বিজুলি, এসো বিপাশা।

হারে রেরে রেরে আমায় ছেড়ে দেরে দেরে।
যেমন ছাড়া বনের পাখী মনের আনন্দে রে।
ঘন শ্রাবণধারা যেমন বাঁধন হারা,
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত আকাশ লুটে ফেরে।
হারে রেরে রেরে আমায় রাখ্‌বে ধ'রে কেরে।
দাবানলের নাচন যেমন সকল কানন ঘেরে।
বজ্র যেমন বেগে গর্জ্জে ঝড়ের মেঘে,
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্নবাধার বক্ষ চেরে॥

সভাকবি

মহারাজ, আমাদের দুর্ব্বল রুচি, ক্ষীণ আমাদের পরিপাকশক্তি। আমাদের প্রতি দয়ামায়া রাখবেন। জানেন তো ব্রাহ্মণা মধুরপ্রিয়াঃ। রুদ্ররস রাজন্যদেরই মানায়।

নটরাজ

আচ্ছা তবে শোনো। কিন্তু বলে রাখছি, রস জোগান দিলেই যে রস ভোগ করা যায় তা নয়, নিজের অন্তরে রসরাজের দয়া থাকা চাই।

মন মন উপবনে চলে অভিসারে আঁধার রাতে বিরহিণী।
রক্তে তারি নূপুর বাজে রিনি রিনি।
দুরু দুরু করে হিয়া,
মেঘ উঠে গরজিয়া,
ঝিল্লি ঝনকে ঝিনি ঝিনি।
মন মন উপবনে ঝরে বারি ধারা,
গগনে নাহি শশি তারা।
বিজুলির চমকনে
মিলে আলো খনে খনে,
খনে খনে পথ ভোলে উদাসিনী।

নটরাজ

অরণ্য আজ গীতহীন—বর্ষাধারায় নেচে চলেছে জলস্রোত বনের প্রাঙ্গণে,—যমুনা, তোমরা তারি প্রচ্ছন্ন সুরের নৃত্য দেখিয়ে দাও মহারাজকে।

নাচ

রাজা

তোমার পালা বোধ হচ্চে শেষের দিকে পৌঁছল—এইবার গভীরে নামো যেখানে শান্তি, যেখানে স্তব্ধতা, যেখানে জীবনমরণের সম্মিলন।

নটরাজ

আমারো মন তাই বলছে।

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি সে কি সহজ গান?
সেই সুরেতে জাগ্‌ব আমি দাও মোরে সেই কান।
ভুলব না আর সহজেতে সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে যে-অন্তহীন প্রাণ॥
সে ঝড় যেন সই আনন্দে চিত্তবীণার তারে,
সপ্তসিন্ধু দিক্ দিগন্ত জাগাও যে-ঝঙ্কারে।
আরাম হতে ছিন্ন ক'রে সেই গভীরে লওগো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান॥

মহারাজ, রাত্রি অবসানপ্রায়। গানে আপনার অভিনিবেশ কি ক্লান্ত হয়ে এল?

রাজা

কী বলো নটরাজ! মন অভিষিক্ত হোতে সময় লাগে। অন্তরে এখন রস প্রবেশ করেছে। আমার সভাকবির বিরস মুখ দেখে আমার মনের ভাব অনুমান কোরো না। প্রহর গণনা ক'রে আনন্দের সীমা নির্ণয়! এ কেমন কথা!

সভাকবি

মহারাজ, দেশকালপাত্রের মধ্যে দেশও অসীম, কালও অসীম কিন্তু আপনার পাত্রদের ধৈর্য্যের সীমা আছে। তোরণদ্বার থেকে চতুর্থ প্রহরের ঘণ্টা বাজল—এখন সভাভঙ্গ করলে সেটা নিন্দনীয় হবে না।

রাজা

কিন্তু তৎপূর্ব্বে উষা-সমাগমের একটা অভিনন্দন গান হোক্। নইলে ভদ্র-রীতিবিরুদ্ধ হবে। যে অস্তগমন নব অভ্যুদয়ের আশ্বাস না রেখেই যায় সে তো প্রলয়-সন্ধ্যা।

নটরাজ

এ কথা সত্য। তবে এসো অরুণিকা, জাগাও প্রভাতের আগমনী। বিশ্ববেদীতে শ্রাবণের রসদানযজ্ঞ সমাধা হোলো। শ্রাবণ তার কমণ্ডলু নিঃশেষ করে দিয়ে বিদায়ের মুখে দাঁড়িয়েছে। শরতের প্রথম উষার স্পর্শমণি লেগেছে আকাশে।

দেখো দেখো শুকতারা আঁখি মেলি' চায়,
প্রভাতের কিনারায়।
ডাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে,—
আয় আয় আয়।
ও যে কার লাগি জ্বালে দীপ,
কার ললাটে পরায় টিপ,
ও যে কার আগমনী গায়—
আয় আয় আয়॥
জাগো জাগো সখী,
কাহার আশায় আকাশ উঠিল পুলকি'।
মালতীর বনে বনে
ঐ শোনো ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে শিশির বায়—
আয় আয় আয়॥

নটরাজ

মহারাজ, শরৎ দ্বারের কাছে এসে পৌঁচেছে, এইবার বিদায় গান। রসলোক থেকে আপনার সভাকবি মুক্তি পেলেন বস্তুলোকে।

সভাকবি

অর্থাৎ অপদার্থ থেকে পদার্থে।

বাদলধারা হোলো সারা বাজে বিদায় সুর।
গানের পালা শেষ করে দে, যাবি অনেক দূর।
ছাড়ল খেয়া ওপার হতে
ভাদ্রদিনের ভরাস্রোতে,
দুল্‌ছে তরী নদীর পথে তরঙ্গ-বন্ধুর॥
কদম-কেশর ঢেকেছে আজ বনপথের ধূলি,
মৌমাছিরা কেয়াবনের পথ গিয়েছে ভুলি'।
অরণ্যে আজ স্তব্ধ হাওয়া,
আকাশ আজি শিশির-ছাওয়া,
আলোতে আজ স্মৃতির আভাস বৃষ্টির বিন্দুর॥

---



প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা।
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, ( বীরভূম )
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।